বনিতাজনম

সত্যপ্রিয় ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

একে নীলুপিসি

আমি আমার লাঞ্ছিত জীবনের কথা লিখতে চাই। লিখে ছাপাতে চাই। কিন্তু লিখতে শিখিনি তো। সাদামাটা দুঃখের পাঁচালি কি কেউ ছাপবে?

লিখতে চাই কাঁচা বয়সের মেয়েদের সাবধান করতে আমি যে ভুল করেছি তা যেন তোমরা কেউ কোরো না। তবে ওই-বয়সটা কোনও নিষেধ মানে না। দশ কি এগারো পূর্ণ হতেই কন্যাকাল তো শেষ, তারপর আর কোনরকম উপদেশ কি তাড়নায় কানই দেয় না। তেরো বছর বয়সে মেয়েদের বুঝি পাখা ওঠে। পিঁপড়ের মতো। স্রেফ মরতে। হঠাৎ উড়তে শুরু করে দেয়। তখন পাখিরা ধরে খায়। পাখি মাত্রেই কি ছেলে? ছেলে মাত্রেই কি ওর মতো? পনেরো-ষোলো বছর বয়সে যে-সব ছেলে গোপনে বন্ধু মারফত মেয়েদের হাতে চিঠি পাঠায় তারা সবাই মাংসাশী। তারা চোরাশিকারী।

কিন্তু তেরো বছর বয়সে মেয়েরা হিতবাক্যে কর্ণপাত করে না। হিত আবার কী! শরীরে হঠাৎ যে আগুন আসে তা কি বাপ-মা-গুরুজনের বকাবকিতে শীতল হয়, তা কি শত উপদেশের ফোয়ারাতেও নেভানো যায়!

ফোয়ারা কি, জলকামান! মা দাগতে শুরু করেছিল পুলিশের মতো— যখন ধরা পড়তে লাগলাম।

মায়ের সে কী অগ্নিমূর্তি! কিন্তু পারবে কেন! মেয়েদের তেরো বছর বয়সে রজঃস্রাবের রক্তে মেদিনী ভিজে যায়, অনন্ত বাসুকির ফণার ছোবলে সংসারের মাটি কেঁপে ওঠে! ভূমিকম্পের সেই ম্যাগমাস্রোতে ন্যায়নীতি-বিবেকবুদ্ধি রসাতলে। ওই-অবস্থায় মেয়েদের দেহে-মনে কী যে হয় সে তো শুনতাম বাবার এক বালবিধবা পিসির মুখে: শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবসরজনী, সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি!

বাবার পিসি হলে কী হবে, বয়সে বাবার চেয়ে মাত্র বছর তিনেক বড়ো। বেলগাছিয়ায় কর্পোরেশনের একটা প্রাইমারি স্কুলের গুরুমা। তাঁর চোখের কোণায় সর্বদাই যেন উপহাস দেখতাম, ফাইভ-সিক্স-সেভেনে পড়ার সময় ছুটিছাটায় হাওড়ার দক্ষিণপাড়া থেকে ওঁর বেলগাছিয়ায় কাঠের দোতলা বাড়িতে এসে কতদিন থেকেছি। পঞ্চাশ বছর বয়সেও ওঁর চুলে পাক ধরেনি। বৈধব্যের সনাতনী আচারবিচারের ধার ধারেন না। কমিউনিস্ট পার্টি করতেন, এখনো করেন, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় নাকি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দিদিদের সঙ্গে লঙ্গরখানায় দুর্ভিক্ষের হা-অন্ন মানুষদের খিচুড়ি খাইয়েছেন চোদ্দ বছর বয়সে, পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়, বছর দুই বাদেই বিধবা হন স্বামী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় খুন হওয়ায়, পার্টির ডাকে আটচল্লিশ-ঊনপঞ্চাশ সালে বছর দেড়েক জেলও খেটেছেন, কিন্তু নীলুপিসি দুনিয়ার সবাইকেই খুব ঠেস দিয়ে কথা বলতেন। এখনো বলেন। পুরুষজাতি তো বটেই, নারীজাতিও যেন তাঁর শত্রু এমন-সব কথাবার্তা তিনি সর্বদা বলবেনই। তাঁর ঘরে কয়েকটা

আলমারি, অনেক বই আর মাসিকপত্র সাপ্তাহিক পত্রে ঠাসা। কত যে লোক আসতে দেখেছি তাঁর কাছে, অনেকে কমরেড বলে ডাকত, নীলুপিসিও তাদের অনেককে কমরেড বলে ডাকলেও কেবলই তর্কাতর্কি আর ধমকধামকে সবাইকে অস্থির করে তুলতেন। আমি নীলুপিসিকে বেজায় ভয় পেলেও কেন জানি না ওঁর জীবনের আড়ালগুলি খুঁজে দেখার জন্য কৌতূহল দেখাতে গিয়ে ওঁর হাতে প্রচুর চাঁটি আর কানমলা খেয়েছি। তাতে নিরস্ত হতাম না বলেই হয়তো ছেলেবেলায় উনিই প্রকৃতপক্ষে হয়ে উঠেছিলেন আমারও গুরুমা। আমার মা ওঁকে একদমই পছন্দ করত না, এখনও না, তবু যে আমার আবদারে বাবা আমাকে দু-চার সপ্তাহের জন্য মাঝে মাঝে ওঁর কাছে রেখে আসতেন আর তারই দরুন নাকি আমি অকালপক্ক হয়ে গেছি— পরে এমন গঞ্জনা আমাকে মায়ের মুখে শুনতে হয়েছে।

তেরো বছর বয়সে মেয়েরা বড়ো অভাগী, চারদিক থেকে উঠতি-বয়সের ছেলেরা জোঁকের মতো ছেঁকে ধরে, বেশি বয়সের পুরুষ আত্মীয়রাও আদরের নামে ছানতে থাকে পল্লবিত বয়সের মেয়েগুলিকে। পুরুষদের মধ্যে যারা বদমায়েশ হয় তাদের বেশিরভাগেরই বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। কেন এরকম হয় কে জানে! ওইরকম লোকের পাল্লায় পড়লে অবস্থাটা কী হয়? এই সব ভাবতে গেলে হঠাৎ হঠাৎ কেন যে নীলুপিসির স্বগতোক্তিগুলি মনে পড়ে: লঘু বৃষ্টি হইলেই কুঁড়েতে আইসে বান! এ সব তো দারিদ্র্যের কথা — না, আমার মনে হত মেয়েদের অন্য কোনও দুরবস্থা বোঝাতে তিনি এমন বলতেন।

হ্যাঁ, নীলুপিসি একা-একাই কথা বলতেন। কবিতা আওড়াতেন একলা ঘরে পায়চারি করতে করতে। আমাকে তিনি একদিন রতনবাবুঘাটের শ্মশানের পাশে গঙ্গায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ক্লাস সেভেনের পড়ুয়া আমি। লঞ্চ ভেড়ার জেটিতে বসে উনি আমাকে কত কিছুর মর্ম বোঝাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল বাংলা পাঠ্যবইটা। ওঁর ব্যাখ্যা আমাকে খুব টানত বলে কিছু বই সঙ্গে নিয়েই ওঁর কাছে থাকতে যেতাম। পড়ুয়া হিসেবে আমি খুব বোকা ছিলাম না। কিন্তু অঙ্কটা কিছুতেই মাথায় ঢুকত না বলে পাশের বাড়ির পিতুদা আমাকে অঙ্ক বোঝাতে আসত, ও তখন ইলেভেনের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে — সে সময় উচ্চ-মাধ্যমিকটা ইলেভেনেই হত, ওর ছিল বিজ্ঞানশাখা, লেখাপড়ায় মোটেই দিগ্‌গজ নয়, — পাশ তো সেকেন্ড ডিভিশনে, কিন্তু অঙ্ক বোঝাতে পারত পটাপট, কিন্তু বোঝানো শুরু করার কয়েকদিনের মধ্যেই যা বোঝাতে লেগেছিল তা প্রথম প্রথম ঠিক যেন বুঝতে পারতাম না, লম্বা লম্বা চিঠি লিখে খামের মধ্যে পুরে রেখে যেত, সেগুলো কাকে লেখা বুঝতে পারতাম না কেননা তাতে না থাকত কোনও সম্বোধন, ইতি দিয়েও কোনও নাম থাকত না। সে-সবের অর্থও ঠিক বুঝতে পারতাম না। কত যে কবিতার কোটেশন। একদিন চিঠিতে লেখা ছিল, উত্তর দিচ্ছ না কেন। কাল যেন উত্তর পাই। মন ছমছম করত। শেষে একদিন অঙ্ক বুঝিয়ে চলে যাবার আগে বলল এই সাবজেক্টটা বেশ ভালো করে পড় তা'লেই সব অঙ্ক ঝপাঝপ বুঝে যাবি বলে একটা বই আমার কোলে গুঁজে দিয়ে কেমন মিচকি হেসে চলে গেল — বইটা খুলতেই দেখি আবার একখানা খাম। তার মধ্যে যে চিঠি সেটা যে আমাকেই লেখা, তাতে আর সন্দেহ ছিল না। লিখেছে:

দুলি, তোকে অঙ্ক শেখাতে আসি কেন তা কিছুতেই বুঝতে পারছিস না কেন? তোকে আমি ভালোবাসি, তোকে আমি আমার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি... সেটাও লম্বা চিঠি, কত কিছু লেখা ছিল, কখন পেছনে মা এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পাইনি। হঠাৎ চিঠিটা কেড়ে নিয়ে পড়ল, তারপর আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মা আমাকে কী ভীষণ মারতে লাগল — দিদু এসে আমাকে না বাঁচালে আমি সেদিনই মরে যেতাম। তারপর কয়েকদিন পর্যন্ত আমি ঘরের মধ্যে বন্দী। স্কুলে যাওয়াও বন্ধ, আমার ছোটোবোন সুপি তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে। সেও আমার কাছে আসতে পারে না, হঠাৎ মা-বাবার কানাকানি আলাপে বুঝলাম আমাকে কিছুকালের জন্য বেলগাছিয়ায় নীলুপিসির কাছে গিয়েই থাকতে হবে। পিতুর ওই চিঠিটা কোথায় গেল কে জানে, কিন্তু ওই কারণে আমার কপালে যে এত ভয়ানক কাণ্ড ঘটল তারই ফলে সেই চিঠিটা হয়ে গেল আমার জীবনে ভয়ানক মূল্যবান। তাতে যেটুকু পড়তে পেরেছিলাম তা তো আমি আজও ভুলতে পারিনি। নীলুপিসি কিন্তু ও-সব নিয়ে আমাকে কিছুই বলতেন না।

সেদিন বিকেলে গঙ্গায় তখন জোয়ার, জেটিটা একটু দুলছে, যেখানে লঞ্চের দড়ি বাঁধে সেখানে বসে আছি দুজনে, নীলুপিসির হাতে আমার বাংলা বইটা, তাতে মানকুমারী বসুর একটি লেখা, নাম 'দুইখানি ছবি', তারই মর্ম সেদিন আমাকে বোঝাচ্ছিলেন নীলুপিসি। আমি তা বুঝতে মোটেও চাইনি, স্কুলে বাংলার দিদি যা বুঝিয়েছিলেন তাতেই বুঝে নিতে পেরেছিলাম ছেলেবেলায় সকলেই সুন্দর থাকলে কী হবে, বড়ো হলে অনেকে বদ হয়ে যায়। তখন আমার বয়স কত? তেরো চলছে। আমি কি তখনই বদ হয়ে গেছি? মা অত মারল কেন? বাবা সহজে মেজাজ হারান না, গান-বাজনায় মগ্ন থাকেন, ভি বালসারার কাছে পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ানে তালিম নিয়েছেন, মাউথ অর্গান মিলন গুপ্তের কাছে, জাঠতুত দাদা ধীরেশজেঠু সহ একটা মিউজিক গ্রুপ নিয়ে একেবারে মেতে থাকতেন, আমাদের বাড়িতে গানবাজনার কত যন্ত্র কত আয়োজন, হার্মোনিয়াম তো সব বাড়িতেই থাকে, তদুপরি আমাদের ছিল পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান, জাজ, ড্রাম, মাউথ অর্গান, আড়বাঁশি, খঞ্জনি, এসরাজ, এমনি গিটার, স্প্যানিশ গিটার, বঙ্গো-কঙ্গো, আরও কত কিছু, ওই-ঘটনার পরে যেন বজ্রপাতে সব বন্ধ, বাবা আমাকে মুখ হাঁড়ি করে নীলুপিসির কাছে ফেলে দিয়ে গেলেন। তাই ছেলেবেলার সুন্দর বড়ো হয়ে বদ, এ-সব আমি বুঝে গিয়েছিলাম, তবু নীলুপিসি (বাবার পিসি হলেও আমিও ওঁকে নীলুপিসিই ডাকি) সেই কথাটাই হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য কেন যে অত গভীর গভীর কথা বলছিলেন সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। ভালোবাসার চিঠি কিছুই জানি না বুঝি না তত কাঁচা আমি ছিলাম না, স্কুলের অনেক বন্ধুই তা পেত, তা দেখেছিও, তা নিয়ে কত কানাকানি হাসাহাসি গুজুরগুজুর বন্ধুরা করতাম, তা যে কত ভয়ানক সেটা টের পেলাম প্রত্যক্ষ ভালোবাসার চিঠি স্বয়ং আমি যেদিন প্রথম পেয়ে ভাবছিলাম আজ স্কুলে গিয়ে ওটা নিয়ে খুব জমবে — কিন্তু হঠাৎ সব অন্যরকম হয়ে গেল। কিন্তু নীলুপিসির ধাতই হল সব-কিছুরই তাৎপর্য বোঝানো, ভীষণভাবে ঘাড় নেড়ে নেড়েও সেই মর্মান্তিক বোঝানো নিরস্ত করা যায় না, উনি তখন শ্রোতাকে ক্রমশ বিশ বাঁও জলের গভীরে না নিয়ে ছাড়বেনই না। ধান ভানতে শিবের গীতের মতো মানকুমারী বসুর জীবনী, তার তাৎপর্য, দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে উনিশ বছর বয়সে বিধবা না হলে কেন তাঁকে কবিতা আর অন্য সব সাহিত্য সৃষ্টি করার জ্বালাতন ভোগ

করতে হত না, তাঁর জীবনের সঙ্গে কোথায় কীভাবে নীলুপিসিরও মিল আছে অথচ মিল নেই এসবও আমাকে প্রাঞ্জলভাবে বুঝে নিতে হচ্ছিল।

তো নীলুপিসি বোঝাচ্ছিলেন অনেক সুকুমার শিশুই কালক্রমে ভয়ানক-দর্শন যুবকে কেন পরিণত হয়। যদিও দুখানা ছবি একই ব্যক্তির, তবু শৈশবের সৌন্দর্য আর পবিত্রতা ঘুচে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে কুৎসিত কলঙ্ক আর পাপের প্রতিমূর্তি। তাৎপর্যটা যাতে আমার মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করে তার জন্য তিনি অনেক উদাহরণ দিচ্ছিলেন, শুধু আমার বোধের অতীত যত কথা সাজিয়ে সাজিয়ে নয়, প্রত্যক্ষ জঘন্য সব ব্যাপার, সে যে কী আতঙ্কে ফেলছিলেন নীলুপিসি— নদীর ঘোলা জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল খুব সম্ভব একটা কুকুরের মৃতদেহ, সেটার দিকে আঙুল তুলে শেষে ঘৃণায় চোখমুখ ঢেকে বলেছিলেন, ওই দ্যাখ পিশাচবৎ দুর্জন ব্যক্তির কাজ, যে গঙ্গায় শুদ্ধ হতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে আসে, গঙ্গাজলে আচমন করে, তার গর্ভে শবদেহ ফেলল কে? নিশ্চয় পচে যাওয়া বয়স্ক কোনও লোক, শৈশবে কি সে এমন পচা ছিল? জেটির লম্বা সাঁকোটার উপর তখন তিন-চারটে ছেলে— বয়স তাদের কত — পনেরো ষোলোর বেশি না — চিৎকার করে খিস্তি করছিল, মারকুটে এমন খেলা খেলছিল যে আমরা অনেকেই বেশ ভয় পেয়ে যাচ্ছিলাম, নীলুপিসি বলছিলেন, শৈশবে ওরাও কুসুমকোরক ছিল, এখন তো দেখছিস কী হয়েছে কী বলছে কী করছে! এদের কি আর উদ্ধার আছে? পতিতপাবন ঈশ্বরের আর সাধ্য নেই এদের উদ্ধার করেন — অবশ্য ওঁর মতে ঈশ্বর বলে কোনও ব্যাপারই নেই তবু যে-সব মানুষের ঐশ্বরিক শক্তি থাকে তাঁদেরও সাধ্যের অতীত ওদের মধ্যে আর মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনা। কেন বল্ তো? কারণ কুসংসর্গ হল ঢালু জমি, আর মনুষ্যত্ব ঠিক জল, তরল। তরলের ধর্ম অধঃপতন।

উপমা দিয়ে কথা বোঝালে আমার চিরদিনই রাগ ধরে, আসল কথাটা গুলিয়ে দেবার জন্যই নিজের সুবিধাজনক অন্য কথা টেনে আনা। উপমান আর উপমেয় বলতে কী বোঝায় সেটাও তো নীলুপিসির কাছেই শেখা। কিন্তু ওই যে পিতুর চরিত্র বোঝাতে উনি উপমানের প্যাঁচ কষছিলেন সেটা আমার ভালো লাগেনি। পিতুকে তো উনি চোখেও দেখেননি তাহলে ওর চরিত্র পচে গিয়ে জলের অধঃপতন-ধর্ম পেয়ে গেল এ তো কুযুক্তি। বাবা নীলুপিসিকে যে একটা বদ ছেলের কথা বলে গিয়েছেন আর তার নাম পিতু এটা আমি বুঝে গিয়েছিলাম, কিন্তু ভালোবাসার চিঠি লিখলেই সেটা বদামি — এটা আমি মানতে পারছিলাম না। ওরকম চিঠি আমার কত বন্ধুই তো পেয়েছে, তারা তো কেউ ঠেঙানি খায়নি। আমাকে কেউ ভালোবাসতে চাইছে এতে বদামির কী হল! ভালোবাসা কে না চায়? ভালোবাসা জানাতেই তো মানুষের কতরকম চেষ্টা। সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি — তাহলে এটাও বদামি! নাকি জ্যান্ত কিছুকে ভালোবাসা বদামি, অথবা বড়োদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে কাকে কাকে তুমি ভালোবাসতে পারো।

গঙ্গার পাশে নীলুপিসি ভালোবাসাকে তরল আর তার ধর্ম অধঃপতন বোঝাচ্ছিলেন, সেই তিনিই সকালবেলা নিজের ঘরে বসে এক লেখককে রেগেমেগে বলছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র অতি বাজে লেখক কেননা তিনি তাঁর অনেক কাহিনীতে বালবিধবাকে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করিয়ে পাতা ভরিয়েছেন, ভালোবাসায় পাঠকদের মনেও কত রঙ ছড়িয়েছেন,

তারপর বালবিধবার ভালোবাসা পাপ, তাই কাউকে বিষ খাইয়ে মেরেছেন, কাউকে মেরেছেন গুলি করে, কাউকে আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে চুবিয়ে স্বীকার করিয়েছেন আর প্রেম করব না। আমি ওই-সব হাঁ করে গিলছি খেয়াল হতেই নীলুপিসি চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন তুই এখানে কেন, যা ও-ঘরে। আমি পাশের ঘরে না গিয়ে বারান্দার আড়াল থেকে কান খাড়া করে নীলুপিসির আরও অনেক কথাই সেই সকালেই শুনে বুঝে নিয়েছিলাম কাউকে ভালোবাসা এবং সেটা বলার মধ্যে কোনও দোষ নেই— তাহলে বিকেলে সেই ভালোবাসাই তরল পদার্থ এবং সেটা অধঃপতনধর্মী হয়ে গেল কী করে!